চালৈন



প্রকাশনায়

চালৈন প্রকাশনা পর্ষদ

রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ, রাঙ্গামাটি

চালৈন

বিষু সংখ্যা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
১৪১৯ বঙ্গাব্দ, এপ্রিল ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ



Ajit Kumar Tanchangya.
Ex-Office Super,
UNO's office, Kaptai. 2013

প্রকাশনায়

চালৈন প্রকাশনা পর্ষদ
রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ

চাঙৈন

বিষু সংখ্যা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
১৪১৯ বঙ্গাব্দ, এপ্রিল ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদনায়
কল্প রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা

সার্বিক সহযোগিতায়
শ্রীজ্ঞান তঞ্চঙ্গ্যা, রবিন তন্‌চংগ্যা
মিলিন্দ প্রসাদ তন্‌চংগ্যা, শিমুল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
আমাদের চেষ্টাকর্ম যাদের প্রাচুর্যপূর্ণ প্রচারণা-
যাদের আর্থিক ও কৌশলগত সহযোগিতায় এই যাত্রা

প্রকাশনায়
চাঙৈন প্রকাশনা পর্ষদ
রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ

প্রচ্ছদ অলংকরণে
রেজাউল করিম রেজা

কম্পিউটার কম্পোজ
বিপুল তন্‌চংগ্যা ও তড়িৎ তন্‌চংগ্যা

মুদ্রণে
সীবলী অফসেট প্রেস
কাকলী মার্কেট, কাঠাঁলতলী, রাঙ্গামাটি।
ফোন ঃ ০৩৫১-৬১৮৮২

তন্‌চংগ্যা রমণীদের পাঁচ পোশাকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তার নৃতাত্ত্বিক দিক

——————অজিত কুমার তন্‌চংগ্যা
দক্ষিণ কালিন্দীপুর, রাঙ্গামাটি।

ইতিপূর্বে পাক-ভারত উপমহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে যত মঙ্গোলিয় জনগোষ্ঠির লোক ছিল এবং বর্তমানে আছে তাদের মধ্যে চেহারাগত বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্য খোঁজা দুরুহ কাজ। সকলকেই কমবেশী মনে হয় এক ও অভিন্ন। ভুটানি, নেপালী, থাইল্যান্ডী, বার্মিজ, কম্বোডিয়ান, ভিয়েতনামী এবং অপেক্ষাকৃত কম জনগোষ্ঠির লোক যেমন- চাক্‌মা, মার্মা, ত্রিপুরা, তন্‌চংগ্যা ইত্যাদি জনগোষ্ঠির লোকদের চেহারাগত তফাৎ খোঁজা খুবই কঠিন কাজ। এতো গেল এ অঞ্চলে বসবাসরত মঙ্গোলিয় জনগোষ্ঠির চেহারাগত মিল-অমিলের দিক।

বাংলাদেশের বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার জেলা ও চট্টগ্রাম জেলার কিয়দাংশে বসবাসরত এগারটি বড় কিংবা ছোট দলভুক্ত পাহাড়িদের মধ্যে কমবেশী প্রত্যেকটি জাতিসত্বার নিজস্ব ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, ধরণ-ধারণ তথা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারা স্ব স্ব রীতিতে বহমান। তন্মমধ্যে কিছু সংখ্যক জাতিদের বাংলা ভাষা ও নিজ নিজ মাতৃ ভাষায় সাহিত্য চর্চার রীতি প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত উন্নত। কিছু কিছু জাতির জীবনাচার ঘোরাচ্ছন্ন ও অজ্ঞতায় পূর্ণ ছিল বিধায় হয়তো পুরানো রীতি-নীতি থাকলেও তা তারা ধরে রাখতে পারেনি। প্রত্যেকে কিছু না কিছু নিজেদের জাতিসত্বার ইতিহাস ও ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি মৌখিক কিংবা লিখিত দলিলের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় জিইয়ে রেখে চলেছে; কেহ হারিয়েও ফেলেছে। এ অঞ্চলে বসবাসরত পাহাড়িদের নিয়ে সেই পর্তুগীজ, বৃটিশ এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে গুটি কয়েক লেখক; যেমন- জন হেমিল্টন বুকানন, ডঃ ফ্রান্সিস, ফেরী, হ্যার্সিসন, ওয়াজিবুল আজিজ, ডে-বোরোস, সতীশ ঘোষ, টি.এইচ.লুইন, আব্দুল হক প্রমুখ লিখে গেছেন। কেহ শখের বশবর্তী হয়ে, কেহ রাজনৈতিক কারণে নিজ নিজ ইতিহাসের ধারাকে শ্রোতধার রূপে বজায় রেখে মূল বাস্তবতাকে এড়িয়ে ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এতে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত বাস্তবতা ধামাচাপা থেকেই গেছে বৈকি।

বেশী দিনের কথা নয়- বিগত ৬০ থেকে ৭০ বৎসরেরও আগে এখানকার মানুষের জীবনধারা, পোশাক পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, আচার-আচরণ বর্তমানের চেয়ে বহুলাংশেই অজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ছিল। অশিক্ষা-কুশিক্ষায় সমাজ জীবন ছিল ঘোরাচ্ছন্ন যুগের মতই। তদ্রুপ ১০০ থেকে ১৫০ বছর আগের অবস্থা হয়তো আরও অনেক অনেক অজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ও অঘোর ঘোরাচ্ছন্নে ছিল। এ অঞ্চলের বিভিন্ন লেখকের লিখনীতে ও প্রবীন ব্যক্তিবর্গের ভাষ্যমতে জানা যায় যে- বর্তমানের তন্‌চংগ্যা জনগোষ্ঠীরাই মূল চাকমা জাতি ছিল- এ কথা প্রবীণ চাকমা সমাজে বহুল প্রচলিত ও স্বীকৃত ছিল এবং বর্তমানে ও চাকমাদের কাছে এ বদ্ধমূল ধারণাটি আছে। চাকমা জাতি সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন সময়ে ইতিহাস রচনা করেছেন। বর্তমান চাকমা ও তন্‌চংগ্যারা একই জাতিসত্বার উত্তরসুরি বলা হলেও আদৌ সত্য কিনা তার প্রকৃত তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ সঠিকভাবে কোথাও পাওয়া পায়নি। পর্তুগীজ, মোগল ও ইংরেজ আমলের বিভিন্ন অফিস আদালতের তথ্যাদি ও সমসাময়িক ইতিহাসবিদগণের বর্ণনায় বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যায়- এতে কেহ তন্‌চংগ্যা ও চাকমা জাতির ভিন্নতার পক্ষে মত দিয়েছেন। কেহ কেহ এক ও অভিন্ন বলে যুক্তি দেখিয়েছেন। চাকমা ও তন্‌চংগ্যাদের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অধিকাংশই মিল আছে বলেই অনুমান ভিত্তিতে বলা হয়ে থাকে তন্‌চংগ্যা ও চাকমারা একই জাতিভূক্ত।

বাবু বিরাজ মোহন দেওয়ান কর্তৃক রচিত **"চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত"** বইটিতে বলা হয়েছে- তন্‌চংগ্যা ও চাকমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেবল কালের গর্ভে ও কালক্রমে পৃথক অবস্থানের ফলে ভাষা, আচরণ, কথন ভঙ্গিতে পরিবর্তন হয়েছে। যেহেতু লোকসাহিত্য বা লোকগীতি ***"গীংগুলি"*** গীতের সুর, ব্যক্তি, উপাত্ত- উপাখ্যান, উপকরণাদি (যেমনঃ- চান্দবি বার মাস, চাদিগাং ছাড়া পালা, রাধামন ধনপুদি পালা, গীলা পাড়া পালা, মিঙাবি বারমাস ইত্যাদি), উবাগীত প্রভৃতি উভয় সংস্কৃতিতে প্রবাহমান হয়ে এসেছে।

অপরদিকে তন্‌চংগ্যা জাতি পরিচিতিতে তন্‌চংগ্যা সমাজের প্রখ্যাত লেখক বাবু বীর কুমার তন্‌চংগ্যা তন্‌চংগ্যাদের একটি আলাদা জাতি হিসাবে বিভিন্ন প্রমাণাদি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে যেহেতু চাকমাদের ৪৬টি গোজা-গোষ্ঠির মধ্যে তন্‌চংগ্যাদের ১২টি গোজার একটিরও অন্তর্ভূক্তি নেই; সেই দৃষ্টিতে তাঁর যুক্তি অকাট্য। তন্‌চংগ্যাদের ভাষার মধ্যে অনেক বাংলা শব্দ প্রয়োগ আছে বলে বিভিন্ন লেখক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জেনেছেন। বাংলা ভাষার শব্দ তন্‌চংগ্যাদের মধ্যে প্রচলিত হওয়ার কারণে যুক্তি এই- পতুর্গীজ আমল, মোগল আমল ও বৃটিশ আমল পর্যন্ত ভারতবর্ষের অমঙ্গোলিয়া সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে (বর্তমান চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে) দীর্ঘ প্রায় পাঁচ'শ থেকে পৌনে সাত'শ বছর ধরে তৎকালীন ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও পরবর্তীতে মোগলীয় উত্তরসুরীর সংস্রবে (খাঁ বংশীয়) আসায় তাদের সংস্কৃতি কিছু কিছু ঢুকে পড়াটা বিচিত্র কিছু নয়। যেমন- ছোট বেলায় দেখেছি "ছিন্নী" করতে, বড়দের ভারত-রামায়ন পড়তে কারোর রোগমুক্তির জন্য কালী বাড়িতে মানত করতে বা ***"মা লক্ষীকে"*** পূজা দিতে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের ফলে সে সকল প্রথা আর নেই। বর্তমানে নিজেদের শাক্য বংশের অনুসারী রূপে তন্‌চংগ্যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বিশদ ভাবে বলতে গেলে বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলা, চট্টগ্রাম জেলা ও কক্সবাজার জেলার মানচিত্রের দিকে একটু দৃষ্টি দিলে তা পরিস্কার বুঝা যাবে। দক্ষিণে কক্সবাজার জেলার জেলা সদর, টেকনাফ উখিয়া ও বান্দরবান জেলা সদর, রুমা লামা, নাইক্ষ্যংছড়ি, থানচি, আলীকদম, রোয়াংছড়ি উপজেলা সমূহের বিভিন্ন মৌজাগুলোতে এবং তদসংলগ্ন চট্টগ্রাম জেলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তন্‌চংগ্যাদের বসবাস।

পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত উত্তরে খাগড়াছড়ি জেলায় কোন তন্‌চংগ্যার বসতি নেই। উত্তর-পূর্বে যেমনঃ রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু, বাঘাইছড়ি, বরকল, জুরাছড়ি ও নানিয়ারচর উপজেলার গুলোতে তন্‌চংগ্যার জনবসতি খুবই কম। থাকলেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে যুগ যুগ ধরে বাঙ্গালীদের (হিন্দু ও মুসলিম) সংস্রবে থেকে থেকেই কিছু কিছু বাংলা শব্দ তন্‌চংগ্যাদের ভাষায় ঢুকে পড়েছে।

প্রত্যেক জাতি বা নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি নিজ নিজ রমণীদের স্বকীয় পোশাক পড়লে ঐ জাতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। যেমনঃ শাড়ি পরা রমণী দেখলে বোঝা যায় বাঙ্গালী রমণী, স্কার্ট পরা রমণী কোন পশ্চিমা, থামি পরা কোন রমণী বার্মিজ বা থাইল্যান্ডিয় ইত্যাদি বুঝায়। পার্বত্যঞ্চলে এগারটি উপজাতির মধ্যে তন্‌চংগ্যারা খাগড়াছড়ি জেলা ব্যতীত উল্লেখিত চার জেলায় আনুমানিক ৭০ কি ৮০ হাজারের কম নয়। অবশ্য সরকারী তথ্য মতে তত নয়। তার প্রধান কারণ চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণে কক্সবাজার জেলার সদর, উখিয়া উপজেলা ও টেকনাফ উপজেলা এবং পার্বত্য বান্দরবান জেলার রুমা, লামা, নাইক্ষংছড়ি ও আলীকদম উপজেলার অধিকাংশ

তন্‌চংগ্যারা নিজেদের জমি জমার দলিল পত্রের চাকমা বলে পরিচয় দেয়: মূলক তারা ***"মো-গসা"*** ও ***"ধন্যা-গসাভুক্ত"*** তন্‌চংগ্যা। শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসরতা ও উত্তরাঞ্চলের বর্তমান শিক্ষিত জনগোষ্ঠির সাথে বিচ্ছিন্নতার কারণেই নিজেরা এখনও চাকমা বলে পরিচয় দেয়। হয়তো বা চিরাচরিত জনশ্রুতি বজায় রেখে চাকমা বলে পরিচয় দেয়।

এ বিষয়ে বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা দিতে সুদূর অতীতের দিকে এগোতে হয় ঃ চাকমা জাতির ইহিাস লেখকগনের মতে জানা যায়- কালা বাঘার রাজার দুই রাজপুত্র- বিজয়গীরি ও উদয়গীরি দেশ জয়ের উদ্দেশ্যে উত্তর থেকে যখন দক্ষিণ দিকে দুই সেনাপতি রাধামন ও কুঞ্জধনকে নিয়ে অভিযানে বাহির হন তখন চাদিগাং (বর্তমান চট্টগ্রাম বিভাগের দক্ষিণাংশে) জয়ের পর রোয়াং (বর্তমান লোহাগড়া, উখিয়া ও কক্সবাজার অঞ্চল) বিজয় করে পরবর্তীতে আরাকান দখল করেন। তথায় মগদের পরাজয় করে বংশানুক্রমে রাজত্ব করতে থাকে চাকমা রাজ বংশরা। ১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দে রাজা অরুন যুগের রাজত্বকালে পতুর্গীজ সহায়তায় মগ রাজা মিনধি বিদ্রোহ ঘোষণা করে চাকমা রাজা অরুণযুগকে পরাজিত করে তিন রাজপুত্র ও দুই রাজকন্যাকে বন্দি করেন। এ যুদ্ধে ১০,০০০ যোদ্ধা বন্দি হয় বলে কথিত আছে। যুদ্ধে পরাজিত যোদ্ধা বা সৈনিকেরা (তথা চাকমা সমাজের সকল শক্ত-সামর্থ্য সকল পুরুষগণ) পলায়ন করে গভীর অরণ্যে অবস্থান নিতে হয়েছিল। পরবর্তীতে তারা উত্তর দিকে সরে আসতে থাকে। যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষ হওয়ার পর পরবর্তীতে আরাকান রাজা চাকমা রাজার জ্যৈষ্ঠ রাজপুত্র সূর্যজিতকে (আরাকানী নাম ***"সাজুই"***) নিজের অধীনে ক্যকডোজা প্রদেশের শাসক, দ্বিতীয় রাজপুত্র চন্দ্রজিতকে (আরাকানী নাম-চাম্প্রো) মির্জা বা মিংডোজায় এবং তৃতীয় রাজপুত্র শক্রজিতকে (আরকানি নাম "চৌতা") কংজা নামক স্থানে রেভিনিউ কালেক্টর হিসেবে নিয়োজিত করেন।

যুদ্ধ-বিগ্রহের পর সকল নিরীহ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নারী-শিশুদেরকে আরাকানের উত্তর অংশের পাহাড়িয়া এলাকায় বসবাসের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। মগেরা পাহাড়কে ***"টং"*** বলে। পাহাড়ে বসবাসের অনুমতি প্রাপ্ত চাকমা জাতির ঐ অংশকে তৈনটংগ্যা বা দৈনাক বলে। অনেকের ভাষ্যমতে তৈন গাং নামক স্থানে বসবাসরত চাকমা জনগোষ্ঠি কে তৈন গাঙিয়া নামকরণ হয়ে আসছে। যা পরবর্তীতে তন্‌চংগ্যা উচ্চারিত হয়ে আসছে। এখনও চাকমা সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিরা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে তন্‌চংগ্যারাই মূল বা আসল চাকমা এবং বর্তমান শিক্ষিত চাকমাদের ইতিপূর্বে বলা হতো ***"আনক্যা চাকমা"***। এর প্রধান কারণ হচ্ছে মূল চাকমা রমণীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির রমণীর পাণি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, ফলে তাদের মধ্যে কিছুটা স্বকীয়তা হারিয়ে গিয়ে কেহ কেহ খাস মঙ্গোলিয় চেহারায় বিবর্তন এসে অপেক্ষাকৃত সুঠামদেহী ও সুন্দর মুখাবয়বধারী হয়। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে- প্রকৃত মঙ্গোলিয়রা তত সুন্দর চেহারাধারী হয় না। যেমন- চীনা, থাইল্যান্ডি, ভিয়েৎনামী, কম্বোডিয়ান ইত্যাদি দেশের লোকেরা তত সুন্দর না। কি নারী কি পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই এমন লক্ষ্য করা যায়। মঙ্গোলিয়দের মুখাবয়ব বিষেশতঃ মুখের চোয়াল বেটে, নাক সুউচ্চ নয়; অপেক্ষাকৃত চেপ্টা, গাল ফোলা, বেটে ও প্রশস্ত হয়ে থাকে। তদ্রুপ গড় হিসাবে চাকমা ও তন্‌চংগ্যাদের মধ্যে চেহারাগত পার্থক্য সুস্পষ্ট বোঝা যাবে। তন্‌চংগ্যা রমণীরা শারীরিক ভাবে স্থুল দেহী হয়, ব্যতিক্রমে শীর্ণ দেহী হয়। পক্ষান্তরে চাকমা রমণীরা বেশীর ভাগ মাঝারী দেহী হয়, স্থুল দেহী অপেক্ষাকৃত কম হয়। অপরদিকে মূল চাকমা রমণীরা (দৈনাক রমণীরা) তাদের স্বভাব জাত আচরণ ও

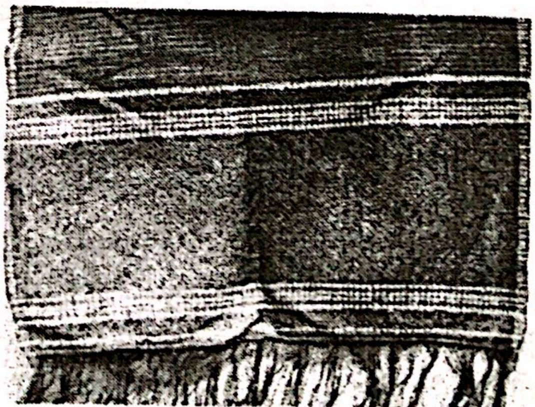
হাতে বুনা কাপড় পরনে অভ্যস্ত বিধায় পোশাকের কোন পরিবর্তন না করে স্বাতন্ত্র বজায় রেখে যুগের পর যুগ ব্যবহার করে এসেছে এবং আজও ঐ ঐতিহ্য বজায় রেখেছে বলেই গর্ব করে কথা প্রসংগে বলে থাকে- ***"পাঁচ পোশাকধারী তন্‌চংগ্যা"*** বা মূল চাকমা। তন্‌চংগ্যাদের বর্ণমালা ও চাকমাদের বর্ণমালার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কেবলমাত্র কয়েকটা বর্ণমালার তফাৎ পরিলক্ষিত হয়। তাও অতি সম্প্রতি গবেষণায় জানা গেছে। অধিকাংশ বর্ণমালার কেবল উচ্চারণগত পার্থক্যের কারণেই এমনটি হয়ে থাকে।

১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধের পর আরাকানে পাহাড়িয়া অঞ্চলে বসবাস করতে দেয়া দৈনাকগণ বহু বৎসর ধরে সেখানে বসবাস করে। পরবর্তীতে মগদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিতারিত চাকমাদের সাথে পুনঃ যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে কিছু সংখ্যক তন্‌চংগ্যা আরাকান ত্যাগ করে উত্তর দিকে নিজেদের দলভুক্ত চাকমাদের সাহচর্য্যের আশায় টেকনাফ, উকিয়া, নাইক্ষংছড়ি, আলীকদম, রুমা, লামা, বান্দরবান জেলার বিভিন্ন এলাকায় বসতি গড়ে তোলে। যুগের বিবর্তনে কিছু কিছু দৈনাক মগদের জনগোষ্ঠির মধ্যে মিশে যাওয়াটা অবাস্তব কিছু নয়। কারণ বর্তমানে উখিয়া ও টেকনাফে বসবাসরত চাকমাদের সাথে ***(মূলত ঃ তন্‌চংগ্যা)*** বর্তমান শিক্ষিত চাকমা ও তন্‌চংগ্যাদের মধ্যে আলাপ কালে দেখা যায়- তারা এমন বিদঘুটে শব্দ ব্যবহার করে তা আমাদের কাছে বোধগম্য হয়না। অধিকাংশ শব্দগুলো বর্মী টিউনে উচ্চারণ করে ও কথা বলে।

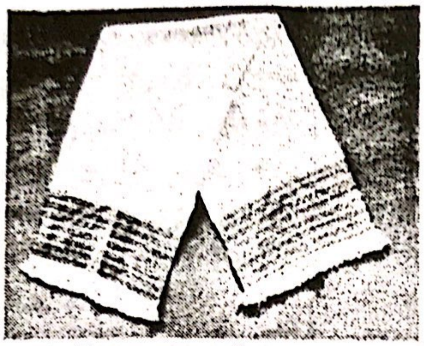
১৯৬০ সনের আগ পর্যন্ত সর্বশেষ উত্তরের মৌজা মানিকছড়ি ঝগড়াবিল, বড়াদম, ওয়াগ্গা ও ঘাগড়া মৌজার সীমা পর্যন্ত তন্‌চংগ্যাদের বসতি ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য কাপ্তাই বাঁধের ফলে উদ্বাস্ত হয়ে বহু তন্‌চংগ্যার পরিবার ও পার্বত্যঞ্চলের মধ্যভাগে যথাক্রমে রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত উপজেলা সমূহে উদ্বাস্ত হয়েছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে- তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে খাগড়াছড়ি জেলায় কোন তন্‌চংগ্যার বসবাস নেই। কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরির কারণে গুটি কয়েক পরিবার হয়তো বসবাস কর থাকতে পারে। এখনও জনশ্রুতি আছে- তন্‌চংগ্যা রমণীরাই চাকমা জাতির রাজ পরিবারের ঐতিহ্য ধারণ করে আছে। তন্‌চংগা রমণীদের পাঁচ পোশাক যথাক্রমে ঃ- (১) সালুম (চাকমা-সিলুম, বাংলা-জামা), (২) খাদি (চাকমা-খাদী, বাংলা- বক্ষবন্ধনী), (৩) পিনৈন (চাকমা-পীনোন, বাংলা-পরনের কাপড়), (৪) ফাউদুরী (চাকমা- ফারদুরী, বাংলা-কোমর-বন্ধনী), (৫) মাধাকবং (চাকমা-খবং, বাংলা-পাগড়ী)।



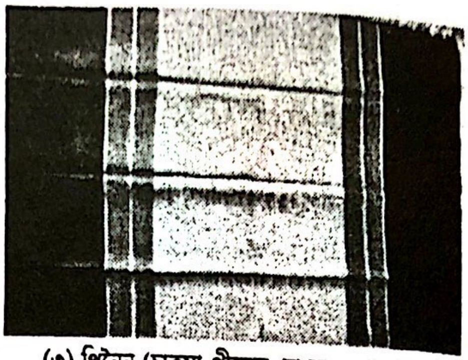
(১) সালুম (চাকমা-সিলুম, বাংলা-জামা)



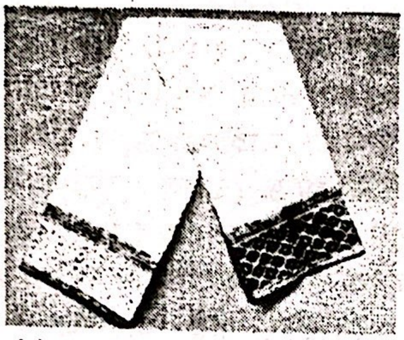
(২) খাদি'র অংশ বিশেষ (চাকমা-খাদী, বাংলা- বক্ষবন্ধনী)



(৪) ফাউদুরী (চাকমা- ফারদুরী, বাংলা-কোমর-বন্ধনী)



(৩) পিনৈন (চাকমা-পীনোন, বাংলা-পরনের কাপড়)



(৫) মাধাকবং (চাকমা-খবং, বাংলা-পাগড়ী)।

পার্বত্যঞ্চলে যত জনগোষ্ঠি আছে ৫০/৬০ দশকের পূর্বে (বর্তমান পার্বত্য সভ্যতার পূর্বে) কোন জনগোষ্ঠির পোশাক-আশাকে এত দৃষ্টিনন্দন ও অপূর্ব কারু কার্য খচিত বাহারী পোশাক বুনন- শৈলীর রেওয়াজ দেখা যেত না। তৎকালীন সময়ে অপরাপর জনগোষ্ঠির পোশাকের সাথে তুলনা করলে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত সম্ভ্রমশীল পোশাক দ্বিতীয়টি ছিলনা। প্রত্যেকটি পোশাক বিচার বিশ্লেষণ করলে তবে'ই বুঝা যাবে এর অতুলনীয় শৈল্পিক কাজ। অবশ্য বর্তমানে পাহাড়িদের মধ্যে সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে আধুনিকতার চিন্তা-চেতনায় সুন্দর সুন্দর পোশাক বুননে কমবেশী সকলেই সচেষ্ট। কিন্তু তন্‌চংগ্যা রমণীদের পোশাকের গুনগত মান ও ঐতিহ্যের বিচারের কথা বলা হচ্ছে আজ থেকে ১০০ থেকে ১৫০ বছরের সময় কালের পোশাকের। অথচ সেই সময় থেকে পোশাকের ক্ষেত্রে অধিকাংশ জনগোষ্ঠির নারীরা বুননে অনুন্নত ছিল। এ পাঁচ পোশাক বিচার-বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে- এই পোশাকগুলোই চাকমা রাজ পরিবারের হত গৌরবের ঐতিহ্যবাহী পোশাক যা অতীতের কোন কোন যাত্রা থিয়েটারে রাজা-বাদশাদের মাথায় পাগড়ি পরিধানের রেওয়াজ লক্ষ্য করা যায়। এই পাগড়ি সম্মানের ও আভিজাত্যের প্রতীক। হয়তো কেহ কেহ বলবেন- কোন কোন উপজাতিয় পুরুষ বা মহিলারা ও তো পাগড়ি ব্যবহার করে থাকেন। এ কথাটা শতঃসিদ্ধভাবে বলা যায় যে- তন্‌চংগ্যা রমণীদের উল্লেখিত পাঁচ পোশাকের মত অন্যান্য কোন জনগোষ্ঠির রমণীদের মধ্যে এত সুচারু, সুনিপুন ও সমান মাপের এবং সুনির্দিষ্ট ডিজাইনের ছিল না।

নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, কৃষ্টি, ভাষা ও বর্ণমালা তথা সামগ্রিক বিচারে চাকমা ও তন্‌চংগ্যা বলতে আদৌ কোন দ্বি-জাতি ছিল না। একই জাতির হাজার বছরের ঐতিহাসিক বিবর্তন ও নির্মম পরিণতিতে সুদীর্ঘ সময়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় ও অন্য জাতির সংস্কৃতির ছোঁয়ায় কথায়, আচার-আচরণে যৎকিঞ্চিৎ বিবর্তনের ফলেই আজ তন্‌চংগ্যা জাতির উদ্ভব।

এখনো শিউরে উঠেন ভূপেন্দ্র মাস্টার।

পূর্ববর্তী সময়ে, অর্থাৎ বাঁধের আগে রাঙ্গামাটি পুরান বাজারে খুব সস্তায় জিনিসপত্র পাওয়া যেতো।

তখনকার বিভিন্ন জিনিসের মূল্য নিম্নরূপ ঃ

ধূতি	- যত হাত তত আনা
চাউল	- টাকায় ২২ সের
মদ	- চার বোতল ১ টাকা
শুকর	- ১ থেকে দেড় মণ ওজন- ১২ টাকা
লাল কালো সূতা	- সের- ১ টাকা
রেলি ছাতা	- প্রতিটি পাঁচ টাকা
জিলিপি	- প্রতি সের - ২ আনা
৪ দাঁত/৬ দাঁত মহিষ	- ৩০/৪০ টাকা
হোটেলে পেট ভরে মাছ ভাত মাংস	- ১ টাকা।



রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা

চিত্র শিল্পী রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যার বাল্যভূমি এখন অতলান্ত জলে নিমর্জ্জিত

আজ থেকে অর্ধশতাব্দি আগে রাঙ্গামাটির কর্ণফুলী নদীর উত্তাল স্রোতকে স্তব্ধ করে দিয়ে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। এই বাঁধের কারণে কর্ণফুলীর দু'পাশের বিস্তীর্ণ জনপদ আজ পানির নিচে নিমর্জ্জিত। কাপ্তাই বাঁধে ডুবে গেছে রতিকান্তের পিতার বাড়ি-ঘর, জমি-বাগান। ৫২ ধানী জমি ছিল তাদের। সরকার একর প্রতি ১নং জমির জন্য ৩০০ টাকা, ২নং জমির জন্য ২০০ টাকা এবং পাহাড়ের জন্য ১০০ টাকা হারে ক্ষতিপূরণ দিয়ে ছিলো। এটা সবাই পায়নি। যাদের পাহাড় বন্দোবস্তী করা ছিলো, জমি রেজিঃ করা ছিলো তারাই কিছুটা ক্ষতি পূরণ পেয়েছিলো।

কাপ্তাই বাঁধের ফলে বিলাইছড়ি এলাকা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে বহু পরিবার সীমান্তের ওপারে মিজোরাম ও আরাকান গিয়েছিল। বহু পাহাড় জঙ্গল এমন দুর্গম পথ অতিক্রম করতে অনাহারে, অসুখে বহু মারা যায়। ১৯৬০ সালের আগে রাইংখ্যং এলাকা অর্থাৎ বিলাইছড়িতে ভাসান্যা বেপারি বাঙ্গালী ছাড়া স্থায়ী বাঙ্গালী নেই বললেই চলে। পুরো এলাকা জুড়ে মানুষের পারিবারিক স্বচ্ছলতা খুবই ভাল। বাঁধের কবলিত বহু তঞ্চঙ্গ্যা রাইংখ্যং নদীর ফারোয়া রিজার্ভে আশ্রয় গ্রহণ করে। সে সময় বন বিভাগের কর্মচারীরা যথেচ্ছা অসদাচারণ আচরণ করেছিলো। তাদের উপর স্বজন হারানো, ঘর-জমি, ডুবে যাওয়া করুণ মর্ম বেদনা বার বার রতিকান্তকে আঘাত হানে।